গণঐক্যই জাতীয় সংকট মোকাবেলার একমাত্র পথ সদর রাস্তা

ফরহাদ মজহার

আগস্ট মাসের ২১ তারিখে আওয়ামী লীগের সভায় গ্রেনেড হামলার ভয়াবহতা এবং বীভৎসতায় মানুষ স্তম্ভিত। হত্যাকাণ্ডের রাজনীতি বাংলাদেশে নতুন কিছু নয়। তবে প্রকাশ্য সভায় বৃষ্টির মতো গ্রেনেড মেরে রাজনৈতিক দলের নেতা এবং একই সঙ্গে নিরীহ মানুষ হত্যার নজির নতুন। এ ধরনের পরিস্থিতি জনগণ কিভাবে মোকাবেলা করবে সে অভিজ্ঞতা তাদের নেই। ফলে ক্ষোভের চেয়েও ভীতি এবং বেদনার চেয়েও অসহায়তা মানুষের মনে ভর করেছে বেশি। স্বাভাবিক কারণে আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দও ভয় পেয়েছেন। গণমাধ্যমে শেখ হাসিনার প্রতিক্রিয়া, বিশেষত একটি পত্রিকায় তার ভয়মিশ্রিত অসহায় চাহনি বাংলাদেশের জনগণের মধ্যেও সঞ্চারিত হয়েছে। এরই মধ্যে হাসপাতালে আইভি রহমান মৃত্যুর সঙ্গে লড়েছেন এবং এক পর্যায়ে তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন। নিজ গুণে আইভি রহমান দলনির্বিশেষে বাংলাদেশে খুবই জনপ্রিয় ব্যক্তিত্ব। তার মৃত্যুর ক্ষতি রাজনৈতিক মহলে সীমাবদ্ধ থাকবে না। তিনি নারী আন্দোলনের সঙ্গে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। তিনি আমাদের সবার মনে অনেক বড় আসন নিয়ে হাজির থাকবেন।

এই ভয় এবং অসহায়তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোই এই সময়ের সবচেয়ে সঠিক রাজনীতি। জনগণের মধ্যে ভীতি এবং অসহায়তা যদি এখন চেপে বসে তাহলে বাংলাদেশের জন্য সেটা হবে আরও ভয়াবহ পরিস্থিতি। জনসভা যদি নিরাপদে এবং নির্বিঘ্নে করা না যায় তাহলে সেটা গণতন্ত্রের অতি প্রাথমিক শর্তেরও অবসান। তাহলে এই গ্রেনেড হামলার রাজনৈতিক তাৎপর্য শুধু শেখ হাসি-না কিংবা আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ মেরে ফেলার মধ্যে সীমাবদ্ধ ভাবার কারণ নেই। এর উদ্দেশ্য একই সঙ্গে বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক ভাবনাকেও হত্যা করা। মানুষ যদি ভয়ে আর কোন জনসভায় অংশগ্রহণ না করে, যদি রাজনৈতিকভাবে সংগঠিত হওয়া, প্রতিবাদ জানানো কিংবা নিজেদের কর্মসূচি গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে প্রকাশ্যে হাজির করতে ভীত হয়ে পড়ে তাহলে বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিণতি হবে মারাত্মক। অতএব গ্রেনেড হামলার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের জনগণের বিরুদ্ধেও একটি যুদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। সেই যুদ্ধ মোকাবেলার প্রথম পথ হচ্ছে নিজেদের ভীত ও অসহায় প্রমাণ করা নয়; বরং আততায়ীদের চোরাগোপ্তা হত্যা পরিকল্পনাকে আরও বিশাল জনসভার মধ্য দিয়ে প্রত্যুত্তর দেয়া। জাতীয় ঐক্য ও সংহতি প্রকাশই এখন একমাত্র সঠিক রাজনীতি।

শেখ হাসিনা এবং আওয়ামী নেতৃত্বকে হত্যা করাই এই হামলার উদ্দেশ্য। বিরোধী দলের নেতৃবৃন্দের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা ক্ষমতাসীন সরকারেরই দায়িত্ব। ফলে এ ঘটনার জন্য ক্ষমতাসীন জোট সরকারই পুরোপুরি দায়ী। এর দায়দায়িত্ব সরকারকে অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে। এ ঘটনা বিএনপির গায়ে যে কালো ছাপ লাগিয়ে দিল তা কাটিয়ে তোলা দুঃসাধ্য কাজ। বিশেষত বিএনপি সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন পাওয়ার পরও ইসলামপন্থী দলগুলোর সঙ্গে জোট বাঁধার কারণে এবং শেখ হাসিনা বরাবরই 'মৌলবাদী'রা তাকে হত্যা করবে বলে আগাম হুশিয়ারি দেয়া সত্ত্বেও তার কথার কর্ণপাত না করায় এটাই সাধারণ মানুষের কাছে মনে হবে যে, সরকারের প্রশ্রয়েই এ ঘটনা ঘটেছে। সম্প্রতি শেখ হাসিনা যখন দাবি করেছিলেন, বিদেশে তাকে হত্যার হুমকি দেয়া হয়েছে তখন বিএনপি বিষয়টিকে গুরুত্ব দেয়নি। এমনকি এ ধরনের দায়িত্বজ্ঞানহীন মন্তব্যও করা হয়েছিল যে, যদি তাকে হত্যাই করতে হয় তাহলে বিদেশের মাটিতে কেন? দেশেই তো হতে পারে। ইসলামী দলগুলোর সঙ্গে জোট বাঁধা, এ ধরনের ঘটনা ঘটতে পারে শেখ হাসিনার পক্ষ থেকে বারবার হুশিয়ারি দেয়ার পরও কোন কার্যকর ব্যবস্থা না নেয়া এবং দায়িত্বজ্ঞানহীন মন্তব্য মিলে যে পরিস্থিতি তৈরি করেছে তার বৃত্ত থেকে ক্ষমতাসীন সরকারের বেরিয়ে আসা কঠিন বলেই আমি মনে করি। সেই কারণে বদরুদ্দীন উমর যখন বলেন, হামলাকারীরা এই সরকারের প্রশ্রয়প্রাপ্ত তিনি ঠিকই বলেন (দেখুন যুগান্তর ২৫ আগস্ট ২০০৪)। আমি শুধু তার দেয়া ব্যাখ্যার সঙ্গে আরও যুক্তি যোগ করেছি।

এই হামলা শুধু আওয়ামী লীগের ওপর নয়, বরং আমাদের সবার– এই জনগোষ্ঠীর, এই রাষ্ট্রের আমাদের নীতিনৈতিকতার ওপর হামলা। অতএব এ ঘটনা গুরুতর রাষ্ট্রীয় সংকট। কিন্তু এ অবস্থান গ্রহণ না করে শেখ হাসিনা তার প্রথাগত রাজনীতির জায়গায় দাঁড়িয়ে এই সরকার এবং খালেদা জিয়াই এ ঘটনা ঘটিয়েছেন দাবি করে মানুষের শোক এবং ক্ষোভকে বিভক্ত করে দিয়েছেন। টেলিভিশনে আতাউস সামাদের মন্তব্য থেকেই সেটা পরিষ্কার যে, তিনিও মনে করেন না এটা ক্ষমতাসীন সরকার ঘটিয়েছে। কারণ এ ঘটনা থেকে এই মুহূর্তে তাদের রাজনৈতিক কোন লাভ নেই। বরং সরকার পতনের ভয় আছে। আমাদের সমাজের রাজনৈতিক মেরুকরণ এখনও প্রকট ও প্রবলভাবে দলীয়। অতএব দোষারোপ এবং পাল্টা দোষারোপ দলীয়ভাবে ঘটনাকে ব্যাখ্যা এবং ঘটনার প্রতি জনগণের প্রতিক্রিয়া তৈরি করে। সংকীর্ণ দলীয় অবস্থান থেকে জাতীয় অবস্থানে যাওয়ার যে সহনশীলতা, দূরদৃষ্টি এবং বিচক্ষণতা সেটা শাসক ও শোষক শ্রেণীর কোন পক্ষেই হাজির নেই।

ফলে ঘটনাকে নানা দিকে নেয়ার, নানাভাবে মোচড়ানোর, ঘটনা থেকে দ্রুত রাজনৈতিক ফায়দা তোলার তৎপরতা গ্রেনেড ফাটার মুহূর্ত থেকেই শুরু হয়ে গেছে। গণমাধ্যমগুলোর রাজনৈতিক কানেকশন বা অবস্থানও কমবেশি জনগণের জানা। ফলে গণমাধ্যমগুলো কিভাবে খবরগুলো ছাপছে, টেলিভিশনে প্রচার করছে তার মধ্য দিয়ে কিভাবে সমাজে বিভিন্ন শ্রেণী এবং ক্ষমতার প্রতিযোগী পক্ষ লড়ছে তার মানচিত্র অনায়াসেই আঁকা যায়। বাংলাদেশের সাধারণ মানুষকে শাসক ও শোষক শ্রেণী এবং গণমাধ্যমগুলো যতটা বোকা মনে করে ততটা বোকা তারা নয়। ঘটনার পরিবেশন এবং অর্থ তৈরির মধ্য দিয়ে হত্যাকাণ্ড ঘটার পরপরই বাংলাদেশের জনগোষ্ঠীকে এই সংকট মোকাবেলার জন্য ঐক্যবদ্ধ না করে মেরুকরণ ও বিভক্তির পথই অনুসরণ করা হয়েছে। যার ফল আমরা দেখি যে, এত বড় ঘটনা ঘটার পরও আওয়ামী লীগ দু'দিন যে হরতাল ডেকেছে সেখানে ঢাকায় জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ, বিক্ষোভ, প্রতিবাদ নেই। স্থানে স্থানে হাতেগোনা পিকেটারদের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষ, ধাওয়া এবং পাল্টাধাওয়া এত বড় জাতীয় সংকটের সময় করুণ পরিস্থিতি বলেই মনে হয়েছে। বিভিন্ন স্থানে যে হরতাল পালিত হয়েছে সেটা তো সবসময়ই কমবেশি হয়। এই হরতালের সঙ্গে আগের হরতালের গুণগত পার্থক্য আছে কি?

কথা হচ্ছে এটা পরিষ্কার যে, যারা এ ঘটনা ঘটিয়েছে তারা চাইবে আমরা বিভিন্ন দলে ভাগ হয়ে দলের জায়গায় দাঁড়িয়ে এই হত্যাকাণ্ডের মূল্যায়ন করি, বিচার করি। হত্যাকারীদের ধরা এবং বিচার করার কাজ এতে ধামাচাপা পড়বে। এক দল আরেক দলকে দোষারোপ করতে থাকবে, আর গণমাধ্যমও জনগণকে বিভ্রান্ত করার জন্য সাজানো খবর পরিবেশন করে যাবে। প্রতিটি দলের মধ্যে আবার উপদল আছে। তারাও দলে তাদের অবস্থান পাকা করার জন্য ঘটনাকে তাদের মতো করে ব্যাখ্যা করবে এবং দলকে সেদিকে নিয়ে যেতে চাইবে। এরপর আছে গুজবের রাজনীতি। নানা ধরনের নীতিনৈতিকতাবর্জিত এই রাজনৈতিক পরিস্থিতি থেকে একমাত্র আততায়ীরাই ফায়দা তুলতে পারবে। জাতীয় সংকট হিসেবে যদি দলনির্বিশেষে আমরা হত্যাকারীদের খুঁজে বের করা এবং শাস্তি দেয়ার গণসংকল্প শক্তিশালী করতে না পারি তাহলে বাংলাদেশ ভয়াবহ রাজনৈতিক সংকটে অধঃপতিত হবে, সেটা পরিষ্কার।

এ ঘটনা ক্ষমতাসীন দলের প্রশ্রয় ছাড়া ঘটতে পারে না, এটা যে কোন নিরপেক্ষ এবং বিচক্ষণ নাগরিকের অভিমত হতে বাধ্য। কিন্তু আওয়ামী লীগ যদি দাবি করে ক্ষমতাসীন সরকারই 'পরিকল্পনা' করে স্বয়ং এই হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছে তখন পাল্টা

অন্যদিকে গড়াতে শুরু করে। প্রথমত, প্রমাণ ছাড়া কাউকে অভিযুক্ত করা আইন কিংবা মানবাধিকার কোন নীতির মধ্যেই পড়ে না। এই অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে জোট সরকার আততায়ীদের ধরার কর্তব্য বাদ দিয়ে প্রথমেই চেষ্টা করবে তারা যে এ ঘটনার সঙ্গে যুক্ত নয় সেই সত্য আগে প্রমাণ করা। এমনকি নিজেদের রাজনৈতিক অস্তিত্ব বাঁচানোর জন্য তারা উল্টো প্রমাণ করবে আওয়ামী লীগের মধ্যেই এমন উপদল আছে যারা হত্যাকাণ্ড ঘটাতে পারলে লাভবান হয়। তার অর্থ হচ্ছে পেশাগত কাজে নিজের বিবেক নিয়ে যারা তদন্ত করছেন এবং সত্য উদ্ঘাটনের চেষ্টা করছেন তারা আর কাজ করতে পারবেন না। তাদের কাজ বাধাগ্রস্ত হবে। দোষারোপের এই বিকৃত প্রতিযোগিতায় কারা লাভবান হয় সেটা পাঠকদের আমি ভেবে দেখতে বলি।

ফলে ঘটনার পরপরই হরতাল ডাকা এবং সফল হওয়া না হওয়া যতটা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাটি নিছকই আওয়ামী লীগের দলীয় ইস্যু না করে আততায়ী ও ষড়যন্ত্রকারীদের বিরুদ্ধে দলমত নির্বিশেষে জাতীয় সংকল্প শক্তিশালী করার কাজই এখন আমাদের প্রধান কাজ। যদি এই ইস্যুকে সরকার পতনের আন্দোলনের দিকে নিয়ে যাওয়া হয় আমার ধারণা জনগণ তা গ্রহণ করবে না। তারপর আসবে জাতীয় সংকল্প কার্যকর করার প্রক্রিয়া ও পদ্ধতি। কিন্তু আওয়ামী লীগের সঙ্গে বামদল জোট সরকারের বিরুদ্ধে যেভাবে দ্রুত একত্রিত হয়েছে তাতে বিভক্তির রাজনীতির পথটাই প্রাধান্য লাভ করল। এটা দুঃখজনক।

বলা বাহুল্য, ঘটনা তদন্তের জন্য এক ব্যক্তির তদন্ত কমিশন গঠন মোটেও গ্রহণযোগ্য নয়। ঘটনার পরপরই আওয়ামী লীগের কাছে গ্রহণযোগ্য একটি সংসদীয় কমিটি গঠন হতে পারত একটি ন্যূনতম প্রাথমিক পদক্ষেপ। এই কমিটি তিনটি কাজ করতে পারে :

এক. ঘটনার তদন্ত ও আততায়ীদের খুঁজে বের করা এবং অবিলম্বে শাস্তি দেয়ার জন্য বিচার বিভাগের সঙ্গে সহযোগিতা করা। এই কাজটি আশু কর্তব্য।

দুই. জাতীয় নিরাপত্তার আলোকে এ ধরনের ঘটনা থেকে কোন শক্তি কিভাবে লাভবান হয় তার একটি সংসদীয়– অর্থাৎ জাতীয় বিশ্লেষণ। কারণ এই মানচিত্র ছাড়া একটি জাতীয় নিরাপত্তা নীতি আমরা প্রণয়ন করতে পারব না। অর্থাৎ রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ যদি ভাবতে না শেখেন যে, অভ্যন্তরীণভাবে আমরা কোথায় দুর্বল তাহলে এ ধরনের ঘটনা ঘটার আগেই প্রতিরোধ করার পথ ও পদ্ধতি তারা খুঁজে পাবেন না। মনে রাখা দরকার, শেষাবধি এ ধরনের সংকটকে রাজনৈতিকভাবেই মোকাবেলা করতে হবে– যার চরিত্র হবে জাতীয়, কোনভাবেই দলীয় নয়।

তিন. বাংলাদেশে বিভিন্ন গোপন ও সন্ত্রাসী দল আসলে কে কোথায় কিভাবে কাজ করে সে সম্পর্কে পূর্ণ প্রতিবেদন। গণমাধ্যমগুলোর প্রচার ও অপপ্রচার এক অসহনীয় পরিস্থিতি বাংলাদেশে তৈরি করেছে। এই পরিস্থিতি বিবিধ গুজব ও প্রপাগান্ডার কারখানা হয়ে উঠেছে। যদি উদ্দেশ্যপ্রণোদিত মিথ্যা তথ্য পরিবেশন ও অপপ্রচার আমরা বন্ধ করতে চাই তাহলে অবশ্যই আমাদের একটি সংসদীয় কমিটি থাকা দরকার– যারা বিশেষজ্ঞদের মতো শুনবেন এবং জাতীয় নিরাপত্তার দিক থেকে রাজনৈতিকভাবে বিভিন্ন তথ্য ও তত্ত্ব বিবেচনা ও বিশ্লেষণ করবেন।

এই প্রস্তাবগুলোর প্রাথমিক অনুমান হচ্ছে সংসদকে কিছুটা হলেও ভূমিকা পালন করার জন্য সুযোগ সৃষ্টি করা। আসলে এখানেই আমাদের জাতীয় সংকটের কেন্দ্রবিন্দু নিহিত। এই জোট সরকারের ব্যর্থতার জন্য যদি আমরা তাকে শাস্তি দিতে চাই তাহলে আগামী নির্বাচনের আগে একমাত্র সংসদই হতে পারে সেই শাস্তি প্রদানের ক্ষেত্র। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য, সংবিধানে ফ্লোর ক্রসিংয়ের কোন সুযোগ নেই, ফলে সাংবিধানিকভাবেই আমাদের সংসদ আসলে অচল সংসদ। যদি নেতা বা নেত্রীর মতের বাইরে নিজের মত প্রদানের জন্য পার্টির অবস্থানের বিপরীতে বা বাইরে থেকে কেউ ভোট দেয় তাহলে সাংসদ তার সদস্য পদ হারান। এই সংবিধান আসলে একনায়কতন্ত্রকেই সাংবিধানিক পোশাক দিয়েছে মাত্র। তবুও এই মুহূর্তে সংসদ ছাড়া আমাদের হাতে রাজনৈতিক দিক থেকে গ্রহণযোগ্য– জাতীয় সংকট থেকে উত্তরণের জন্য কার্যকর কোন মাধ্যম হাতে নেই। আর কোন জাতীয় রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান নেই।

জাতীয় সরকার গঠন নিয়ে কথাবার্তা চলছে অনেক দিন। এই সংকট ঘটার সঙ্গে সঙ্গেই এ ধরনের কথাবার্তা আবার শুরু হয়েছে। আমাদের সংবিধান এবং রাষ্ট্র গঠনের সংকট ও তার সমাধানের প্রশ্ন এড়িয়ে যারাই জাতীয় সরকারের কথা বলেন তাদের শ্রেণী ভিত্তি আমাদের খেয়াল করতে হবে। এদের মধ্যে আছে ক্ষমতাসীন বা ক্ষমতার প্রতিযোগী দুই প্রধান রাজনৈতিক দল বা দলীয় ধারার বাইরে শাসক ও শোষক শ্রেণীরই বিভিন্ন বিক্ষিপ্ত ব্যক্তি বা দলছুট গ্রুপ। জনগণের মধ্যে এদের এমন কোন গ্রহণযোগ্যতা নেই যে তারা নতুন একটি শক্তি হয়ে উঠতে পারে। আওয়ামী লীগ, বিএনপি এবং বামদলগুলোর মধ্যে যাদের কোন গণভিত্তি নেই বা যারা দ্রুত সেই জনগণের সঙ্গে সংযোগ ও সম্পর্ক হারাচ্ছে তারাই জাতীয় সরকার নিয়ে ব্যতিব্যস্ত থাকে। এরাই তৃতীয় ধারা, বিকল্প ধারা ইত্যাদি নানা নামে তাদের নিজেদের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করে। এই আকাঙ্ক্ষার মাত্রা স্থির হয় এদের পেছনে সমাজের নতুন উঠতি ব্যবসায়ী শ্রেণী কিংবা আন্তর্জাতিক মহল কতটা মদদ দিচ্ছে তার ওপর। বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী কিংবা বাংলাদেশের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি বা যে কোন ব্যক্তি যিনি আন্তর্জাতিক শক্তির এবং দাতাগোষ্ঠীর কাছে গ্রহণযোগ্য তাদের পেছনে উঠতি ব্যবসায়ী শ্রেণী, এনজিওদের একাংশ এবং রাজনীতিতে হতাশ ও ব্যর্থ পাতিবুর্জোয়ারা সমবেত হচ্ছে। এ ধরনের বিভ্রান্তিকর দাবি এবং প্রক্রিয়াই মূলত আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রের দেশীয় উপায় হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

ফলে আমাদের সাংবিধানিক ইস্যুকে এড়িয়ে গিয়ে, আর্থ-সামাজিক নীতির প্রশ্নে ঐকমত্য গড়ে তোলার প্রয়াস না চালিয়ে– এমনকি বিচার বিভাগকে নির্বাহী বিভাগ থেকে আলাদা করার মতো অতি গুরুত্বপূর্ণ প্রাথমিক কর্তব্য সম্পাদনের সংগ্রাম না করে যারাই জাতীয় সরকার, বিকল্প ধারা, তৃতীয় ধারা ইত্যাদি তত্ত্ব ফেরি করেন তাদের আমরা অনায়াসেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং সাম্রাজ্যবাদীদের স্বার্থের রক্ষক বলে ধরে নিতে পারি। এই প্রকল্পগুলো আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ছাড়া জারি থাকতে পারে না। এই প্রকল্প সফল করার রাজনীতিটা অতি পরিচিত মার্কিন-ইহুদিবাদী-বিজেপি নীতি। মোটা দাগে তার তিনটি দিক আছে। সেই তিনটি দিক ভালভাবে আমাদের বুঝতে হবে :

প্রথম দিক হচ্ছে, সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্বব্যাপী জঙ্গি যুদ্ধ ও বর্বর হত্যাকাণ্ড বৈধ করার জন্য ইসলামকে বর্বর, জঙ্গি এবং সন্ত্রাসীদের ধর্ম বলে প্রমাণ করা। একেই আমি আঞ্চলিক পরিপ্রেক্ষিত মনে রেখে মার্কিন ইহুদিবাদী-বিজেপি নীতি বলছি। ইসলামকে বর্বর প্রমাণ করার জন্য ইসরাইলি গোয়েন্দা সংস্থা মোসাদের পরিকল্পনা অনুযায়ী উন্মুক্ত জনসভায় বোমা ও গ্রেনেড হামলা চালিয়ে নিরীহ নিরপরাধ মানুষ হত্যা করে গণমাধ্যমে অপরিচিত ও অচেনা ইসলামী দলের নামে হত্যাকাণ্ডের দায়দায়িত্ব স্বীকার করা এই নীতির অতি পরিচিত ধরন। ধর্ম হিসেবে ইসলাম এবং সেই ধর্মের অনুসারীদের হেয় ও হীন প্রতিপন্ন করা এবং সেই ধর্মের অনুসারীদের মধ্যেও হীনমন্যতাবোধ জাগিয়ে তোলাই এই নীতির প্রথম ও প্রধান কাজ। আজ বিশ্বব্যাপী তৃতীয় বিশ্বের গরিব নির্যাতিত জনগণ– যারা ভৌগোলিক কারণে তেল-গ্যাসসহ প্রাকৃতিক সম্পদেরও অধিকারী– তাদের সম্পদ লুট ও তাদের নির্বংশ করার জন্য যে ভয়াবহ যুদ্ধ চলছে, সেই বিশ্বব্যাপী যুদ্ধের প্রধান প্রচার কৌশল হচ্ছে সব দোষ নন্দ ঘোষ নীতি। অর্থাৎ ইসলামই সব দোষের মূল। ফলে আমরা দেখি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধনীতির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ কায়দায় আমাদের গণমাধ্যমে মসজিদ-মাদ্রাসার বিরুদ্ধে– বিশেষত কওমি মাদ্রাসাগুলোর বিরুদ্ধে প্রবল ও প্রকট প্রচার চলছে যে মসজিদ ও মাদ্রাসামাত্রই জঙ্গি ও সন্ত্রাসী তৈরি করে। এর চেয়ে ভয়ানক কুৎসা এবং ভয়াবহ অপপ্রচার আর কিছুই হতে পারে না। খেয়াল করতে হবে সম্প্রতি এই প্রচার তীব্র হয়েছে তখনই যখন মুকতাদা আল সদরকে নাজাফের হযরত আলী (রা.)-এর মাজার শরিফ থেকে উৎখাতের জন্য দখলদার মার্কিন সেনাবাহিনী সামরিক অভিযান চালাচ্ছে।

তার মানে এই নয় যে, জঙ্গি ইসলামী গ্রুপগুলো সন্ত্রাস করতে পারে না। অবশ্যই পারে। কিন্তু তথ্য-প্রমাণ এক কথা আর

প্রপাগান্ডা অন্য জিনিস। একইভাবে কি বড় রাজনৈতিক দলগুলো সন্ত্রাস করে না? তাদের কি কোন জঙ্গি রূপ নেই? ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বা আধুনিক স্কুল-কলেজও কি সন্ত্রাসী বা জঙ্গি রাজনৈতিক দল তৈরি হয় না? তারা বানায় না? অবশ্যই। কেন রাজনীতি সন্ত্রাসের পথে যায় বা সন্ত্রাসীরা রাজনৈতিক পরিচয়ের আড়ালে তাদের অপরাধ লুকানোর কৌশল গ্রহণ করে এবং সফলও হয়, তার কারণ সামাজিক ও রাজনৈতিক। কিন্তু যারা নিরপরাধ মানুষ হত্যা করে তারা নিছকই খুনি– এদের সঙ্গে ইসলামী দল করা, কমিউনিস্ট হওয়া না হওয়া বা বিএনপি, আওয়ামী লীগ, জামায়াত, জাতীয় পার্টি, শিবির করা না করার প্রশ্ন অপ্রাসঙ্গিক। ফলে আজ ধর্মবিশ্বাসী বা নাস্তিক, কমিউনিস্ট বা সংরক্ষণবাদী প্রত্যেকের একটিই জাতীয় সংকল্প হওয়া উচিত– খুনিদের খুঁজে বের করা এবং শাস্তি দেয়া।

মার্কিন-ইহুদিবাদী-বিজেপির যুদ্ধ কৌশলের দ্বিতীয় দিক হচ্ছে অকার্যকর রাষ্ট্রের তত্ত্ব ফেরি করা। যেমন গ্রেনেড হামলা দিয়ে বুঝিয়ে দেয়া হল বাংলাদেশ একটি 'অকার্যকর রাষ্ট্র' এবং কোন রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার দ্বারা এই রাষ্ট্রের শাসন ব্যবস্থা চলবে না। এখন দরকার একজন পল ব্রেমার। যিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইংল্যান্ড, নেদারল্যান্ডস বা সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থের অনুকূলে থেকে দেশ "Govern" করবেন। একটা crisis of governance সৃষ্টি হয়েছে অতএব রাজনীতি দিয়ে– বিশেষত বিএনপি আর আওয়ামী লীগ দিয়ে কিংবা এই দুই মহিলা দিয়ে কিছু হবে না। দরকার বদরুদ্দোজার মতো ব্যক্তিত্ব, দরকার কামাল হোসেনের মতো একজন আন্তর্জাতিক মানের মানুষ। নিয়ে আসা দরকার ফজলে হোসেন আবেদের মতো ব্যক্তিত্ব। অর্থাৎ রাজনৈতিক দল ও রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার বাইরে একটি অরাজনৈতিক প্রক্রিয়া চালু করার চেষ্টা হবে। উদাহরণ হিসেবে যাদের নাম বলছি তাদের নাম বাতাসে আছে বলে বলেছি। তারা নিজেরা কত সজ্ঞান ও সচেতন সেটা জানি না। দেশপ্রেমিক হিসেবে তাদের উচিত হবে এ ধরনের প্রস্তাব ঘৃণার সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করা। আজ আমরা জাতীয় সংকটে অধঃপতিত– এটা আমাদের অভ্যন্তরীণ সংকট যার সুযোগ আন্তর্জাতিক শক্তি নিতে চেষ্টা করবে। সেই চেষ্টা প্রতিহত করতে হবে।

এই যুদ্ধনীতির তৃতীয় দিকটা হচ্ছে, একটি দেশের উঠতি ব্যবসায়ী শ্রেণী বা নব্যপুঁজিপতিদের সঙ্গে আন্তর্জাতিক কর্পোরেট স্বার্থের ঘনিষ্ঠ আঁতাত গড়ে তোলা। হাইতিতে এই সাম্রাজ্যবাদী নীতির সাফল্য এবং ভেনিজুয়েলায় জনগণের সংগ্রামী চেতনার মুখে তার ব্যর্থতা থেকে আমরা শিক্ষা গ্রহণ করতে পারি। সেনাবাহিনীর মাধ্যমে সাম্রাজ্যবাদী শোষণ জারির পুরনো কায়দার জায়গায় আমরা দেখেছি আমলাতন্ত্র এবং বিশ্বব্যাংক, আইএমএফ ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সংস্থার আঁতাত, শাসন ও শোষণ। সেই পর্যায় এখন আর কাজ করছে না। সেখানে আসছে সরাসরি কর্পোরেট বিনিয়োগ এবং ব্যর্থ রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে সীমিত সার্বভৌমত্বের ধারণা। অতএব একটি দেশের অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার বিকাশকে রুদ্ধ করার জন্য জাতীয় সরকার কাঠামো ও তার অধীনে তথাকথিত ব্যর্থ রাষ্ট্রে কর্পোরেট বিনিয়োগ নিশ্চিত করার প্রক্রিয়া বাংলাদেশে বাস্তবায়িত হচ্ছে, এটা আমরা দেখতে পাচ্ছি। যারা মনে করছেন সেনাবাহিনী ক্ষমতা নিতে পারে তাদের আশংকা এই 'অকার্যকর রাষ্ট্র' সংক্রান্ত তত্ত্বের সঙ্গে মিলিয়ে বিচার করতে হবে। রাষ্ট্র যদি অকার্যকর হয় তাহলে সেনা শাসনই ভাল– এই চিন্তার পক্ষে একটা মত কি ইতিমধ্যেই তৈরি করা হয়নি? নিঃসন্দেহে এটা একটা সম্ভাবনা। কিন্তু মনে রাখতে হবে সেনাবাহিনী পরিকল্পনা ও ষড়যন্ত্র করে ক্ষমতা নেবে এটা বাংলাদেশের বাস্তবতায় অবিশ্বাস্য। বলা বাহুল্য, জাতীয় সরকার বা সেনা সরকার যাই হোক সেনাবাহিনীর সমর্থন ছাড়া তাকে টিকিয়ে রাখা যাবে না। ফলে সেনাবাহিনীর একটা ভূমিকা– প্রকাশ্য বা অপ্রকাশ্য, থাকবেই। অন্যদিকে জনগণের সংগ্রামী চেতনার সঙ্গে নাগরিক হিসেবে সৈনিকদের চেতনার সঙ্গতি রচনা ছাড়া এই ষড়যন্ত্র রুখে দেয়া আমাদের পক্ষে সম্ভব হবে না।

আমি পাঠকদের যে দিকটাতে নজর দিতে বলব সেটা হল আমাদের রাজনৈতিক দলগুলোর শ্রেণী রূপান্তর। এক সময় ছিল যখন উকিল, মোক্তার, স্কুল-কলেজের শিক্ষক, মফস্বলের অবস্থাপন্ন মানুষ এমনকি ছোট টাউনের টাউট-বাটপাররাই রাজনীতিতে সক্রিয় ছিল। এদের মধ্য থেকেই রাজনীতি এবং রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় বিশ্বাসী নাগরিকদের– তাদের রাজনৈতিক মতাদর্শ যাই হোক– গড়ে উঠেছে। গত এক দশকে এক বিরাট পরিবর্তন হয়েছে। রাজনীতিতে নিছকই কালো-কামাইয়ের বা কালো টাকার জোরে ঢুকে পড়েছে সেই সব দুর্বৃত্ত ব্যবসায়ী, যাদের কাছে টাকা ছাড়া আর কিছুরই মূল্য নেই। রাজনৈতিক দলগুলো এদেরকেই টাকার বিনিময়ে নির্বাচনী টিকিট দিয়েছে। ফলে আমি নিশ্চিত একজন বঙ্গদেশীয় পল ব্রেমারের নেতৃত্বে যে শক্তি এই গ্রেনেড হামলার সুবিধা ভোগ করতে বদ্ধপরিকর তারা বিএনপি ও আওয়ামী লীগ উভয় দলেই শক্তিশালী। এবং তারা জাতীয় পার্টি, জামায়াত ও অন্যান্য ইসলামী দলেও আছে। টাকা ছাড়া এদের কোন নীতি নেই, ধর্মও নেই।

আওয়ামী লীগে আজ আমরা কি দেখি? যারা দীর্ঘদিন দল করে পাকাপোক্ত হয়েছেন, নানা ঝড়ঝাপটার মধ্য দিয়ে অভাবে-কষ্টে যারা দলটিকে টিকিয়ে রেখেছেন, তারা কিন্তু সামনের সারিতে নেই অর্থাৎ নৌকার হাল তাদের হাতে নেই। আছে অতি প্রকাশ্যভাবে তাদেরই হাতে যারা রাজনীতি থেকে দলে আসেননি, এসেছেন টাকার জোরে। তারা ব্যবসায়ী। তাদের সঙ্গে মার্কিন কর্পোরেট স্বার্থের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ। বোমাবাজি-সন্ত্রাস সৃষ্টি করে বাংলাদেশকে ব্যর্থ প্রমাণ করা– অর্থাৎ রাজনৈতিক দলের আর দরকার নেই– এই সত্য প্রতিষ্ঠা করার ক্ষেত্রে এদের প্রবল স্বার্থ আছে। এদের কিছুই হারানোর নেই। তাদের কাছে আওয়ামী লীগ, বাংলাদেশ কিছুরই কোন মূল্য নেই। সবই ডলার উপার্জনের মাধ্যম মাত্র।

ঠিক তেমনি বিএনপির মধ্যেও একই অভ্যুত্থান ঘটেছে। এই আলোকেই প্রধানমন্ত্রীর দফতরের সাম্প্রতিক ঘটনাবলী এবং যারা আসলে বিএনপির রাজনীতির মূল ব্যক্তিত্ব নন কিন্তু বিএনপি করছেন নিছকই ব্যবসার জন্য– তাদের উত্থান লক্ষ্য করে পরিষ্কার বোঝা যায় বিএনপিরও চরিত্রে বদল ঘটেছে। আমরা আবদুল মান্নান ভূঁইয়াকে শেয়ালের কুমির ছানা দেখানোর মতোই দেখি, কিন্তু বুঝতে পারি বিএনপিতে রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের কোন মূল্য নেই। ক্ষমতা নেই। আছে টাকাওয়ালাদের। তাহলে এদের সঙ্গে আওয়ামী ডলারওয়ালাদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকা ব্যবসায়িক স্বার্থে মোটেও বিচিত্র নয়।

কেন বলছি? কারণ আওয়ামী লীগের সভায় যে ভয়াবহ ও বীভৎস হামলা হয়েছে তার পরিণতিতে বিএনপি ও আওয়ামী লীগ উভয়েই ধ্বংস হবে। এই অর্থে যে উভয় দলেই রাজনৈতিক নেতৃত্বের পরিসমাপ্তি ঘটবে। রাজনীতি হবে বিভিন্ন ব্যবসায়ী ও কর্পোরেট হাউসের মধ্যে প্রতিযোগিতা। একই সঙ্গে ধ্বংস হবে রাজনৈতিকভাবে আমাদের অভ্যন্তরীণ সমস্যা ও সংকট মীমাংসার প্রক্রিয়া। একটা কর্পোরেট শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হচ্ছে যার আশু কাজের মধ্যে আছে গ্যাস সংক্রান্ত কর্পোরেট প্রস্তাব বাস্তবায়িত করা অর্থাৎ বহুজাতিক কোম্পানির হাতে প্রাকৃতিক সম্পদ তুলে দেয়া এবং ইরাকে সৈন্য পাঠানো। একটি মুসলিম দেশ থেকে ইরাকে সৈন্য পাঠানোর মূল্য এখন অনেক অনেক বেশি। ফলে যারা এই কাজটি সমাধান করবেন তারা অতি উচ্চমূল্যেই পুরস্কৃত হবেন। এটা হবে একটা ব্যবসায়িক ডিল– রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত নয়।

যদি আমরা এসব ছোটখাটো বিষয়ও বুঝি তাহলে কিছু দূতাবাসের অতি তৎপরতার মানেও আমরা বুঝব। সব রসুনের গোড়া এক জায়গায়, যদি আমাদের এই গ্রাম্য বুদ্ধিও আমরা খাটাতে পারি আর গোড়াটা কোথায় মাটি খুঁড়ে কোদাল মেরে বের করে ফেলতে পারি, এই ষড়যন্ত্র আমরা অনায়াসেই ঠেকিয়ে দিতে পারব।

নিশ্চয়ই ইসলামী জঙ্গিরা হতেই পারে। কিন্তু আওয়ামী লীগ, বিএনপি, জাতীয় পার্টি বা জামায়াতে ইসলামীর মধ্যে যেসব রসুনের কোয়া বিক্ষিপ্ত হয়ে আছে ওরা নয় কেন? কেন ঘটনাকে অন্যদিকে রঙিন করার এই প্রবল প্রয়াস? এই দেশটিকে ভালবাসেন পত্রপত্রিকায় তারাও আছেন, তারাই সেখানে সংখ্যাগরিষ্ঠ। আশা করি এই দেশের জনগণের সঙ্গে তারা সজ্ঞানে অন্তত বিশ্বাসঘাতকতা করবেন না।

তাদের কাছে বিনীত অনুরোধ– গুজব ছড়িয়ে ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত প্রপাগান্ডায় আসল অপরাধীকে আমরা যেন আড়াল না করি, আর

টুপি-পাঞ্জাবি পরা গরিব ও নির্যাতিত মাদ্রাসার ছেলেদের যেন আমরা 'খুনি', 'আততায়ী', 'জঙ্গি' ইত্যাদি বলে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা না করি। আফগানিস্তান ও ইরাকের বর্বর হত্যাকাণ্ডের ফলে এই দেশের মানুষের মনে গভীর ক্ষত আছে, অনেক কষ্ট আছে তাদের– আছে অনেক বেদনা। তাকে রাজনৈতিকভাবে অনুধাবনের এবং রাজনৈতিকভাবে মীমাংসার চেষ্টা করুন। ওদের অপরাধী বানিয়ে আমরা যেন জর্জ বুশ আর টনি ব্লেয়ারের ভাড়া না খাটি। যেন ওদের ওপর দোষ চাপিয়ে আসল অপরাধীকে আমরা আড়াল না করি। প্লিজ...

১০ ভাদ্র, ১৪১১
শ্যামলী